যুদ্ধের গল্প
যুদ্ধের বিরুদ্ধে

ভাষান্তর ও সংকলন
সুজাতা পান্থী সরকার

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

যুদ্ধ নয়।

সারা দুনিয়ার আমজনতা যে শান্তির স্বপক্ষে সে কথা বলার বোধহয় অপেক্ষা রাখে না।

তবু যুদ্ধ বাঁধে দুই দেশের মধ্যে। কিংবা সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে কখনো কখনো একাধিক দেশ। তখন আর যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকে না দুটি দেশের সীমান্তে। প্রতিটি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রধানত সাধারণ মানুষ। যুদ্ধমান দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে ওঠে টালমাটাল। পরোক্ষভাবে সেই চাপ এসে পড়ে দেশের মানুষের কাঁধে। বদলে যায় সামাজিক অবস্থা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ।

বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের স্মৃতি এখনো বহু মানুষের মনে অমলিন। সেই স্মৃতি আনন্দের নয়, সুখের নয় — ভয়ঙ্কর হাহাকারের স্মৃতি। যুদ্ধের সেই দুঃস্বপ্ন এখনো তাড়া করে ফেরে বহু মানুষকে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বিস্ফোরণের ফলস্বরূপ এখনো বহু নবজাত শিশু পৃথিবীর আলো দেখে বিকলাঙ্গ হয়ে।

তাই প্রতিটি যুদ্ধের গল্পই আসলে প্রতিবাদ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এই গ্রন্থে মোট পনেরোটি গল্পের ভাষান্তর সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই উপন্যাসের অংশবিশেষ। প্রতিটি গল্পেরই প্রেক্ষাপট যুদ্ধ। গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সময় বা ভৌগোলিক অবস্থান প্রাধান্য পায়নি। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত রচিত গল্পগুলি পড়ে বোঝা যায়, যুদ্ধ এনেছে বহুমাত্রিক সমস্যা। কখনো তার উৎস ধর্ম, বর্ণ, দারিদ্র্য, স্নেহ, প্রেম, অসহায়তা — সর্বোপরি অস্তিত্বের সংঘাত। যুদ্ধ না হলে সেই অবস্থার মুখোমুখি কেউ হত না। ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ সবকিছুকে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছে যুদ্ধ। তাই সাধারণ সময়ে বসে সেই সময়ের কোনো ঘটনাকে বিচার করতে যাওয়া সহজ কাজ নয়। যেমন, 'আমরা মেরে ফেলতে যাচ্ছি' গল্পে আমরা দেখি এক তরুণ জাপানি ডাক্তার যার মন থেকে কোনো সায় ছিল না। তবু সে বাধ্য হয়েছিল — আমেরিকান বন্দিদের ওপর নিষ্ঠুর পরীক্ষা চালাতে। 'কর্জ' গল্পটিতে একটি মেয়ের প্রেমিকের কোর্টমার্শাল হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করেছিল বলে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মেয়েটি জানতে পারে আরও একজন সৈনিকের কথা — যে এক অদ্ভুত উপায় খুঁজেছিল বাড়ি ফেরবার জন্য। 'নলখাগড়া'র প্রেমিক পরিত্যক্ত খামার কন্যা প্রতিনিয়ত আত্মীয়স্বজন ও পড়শিদের নিষ্ঠুর মন্তব্য ও অবহেলা সইতে সইতে একদিন আকস্মিকভাবে নিজের গভীরে আবিষ্কার করল এক মহার্ঘ সম্পদ। টের পেল যুদ্ধের সময় আশ্রয় নেওয়া প্রেমিকের সঙ্গে তার অল্পদিনের সুখস্মৃতি এতই গোপনীয়, গভীর আবেগের ও মূল্যবান

যে এই একান্ত নিজস্ব ধনকে কেড়ে নেবার সাধ্য কারুর নেই। ঠিক এমনি করেই, 'যুদ্ধের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ' গল্পে কৈশোর উত্তীর্ণ এক সদ্য যুবতী নির্যাতিত হতে হতে রুখে দাঁড়াল পরিবেশের বিরুদ্ধে। খুঁজে পেল আত্মপ্রত্যয়।

যুদ্ধ ভিতরে। যুদ্ধ বাইরে। 'কেন এলে' বা 'পেছনের সারি' দুটি গল্পই যুদ্ধ সম্বন্ধে মোহভঙ্গের গল্প। আর অপমান বোধ ও প্রতিহিংসা যে কত মারাত্মক হতে পারে — তার নমুনা 'অপরাজেয়'। যুদ্ধের সময় শুধুমাত্র অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখতেই যে কী প্রাণান্তকর মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় মানুষকে, 'যুদ্ধকালীন মিথ্যা' তার প্রতিচ্ছবি। যুদ্ধ মানে অনিশ্চয়তা। যন্ত্রণা। যে জনক জননী সন্তানকে পৃথিবীতে এনেছেন, তাঁদের পক্ষে সেই পুত্রকে হাত ধরে মৃত্যুর পরোয়ানা নিতে পাঠানো যে কত মর্মান্তিক তার অনবদ্য প্রতিলিপি দুটি গল্প — 'যুদ্ধ' এবং 'পোস্টকার্ড'। যুদ্ধ যে জীবনের শক্ত প্রোথিত শিকড়কে কীভাবে নাড়িয়ে দেয় অন্যান্য গল্পগুলিতে তারই ছায়া।

এই সংকলনে ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি গল্প ব্যতীত অধিকাংশ গল্পই মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। অন্য ভাষায় লিখিত গল্প বা উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ থেকেই বাংলা তর্জমা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি অনুবাদকের সীমাবদ্ধতা।

সুজাতা পান্থী সরকার

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০০২

সূচীপত্র

যুদ্ধ	লুইগি পিরানদেল্লো	❑	১১
অপরাজেয়	সমারসেট মম	❑	১৬
ওয়েবস্টার	এডওয়ার্ড ক্রেবিন	❑	৪৯
পেছনের সারি	উইলিয়াম মার্চ	❑	৬০
নলখাগড়া	অ্যানা সেঘার্‌স্‌	❑	৭৬
পোষ্টকার্ড	হেনেরি ব্যোল্‌	❑	৯৩
যুদ্ধের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ	লৌরী লী	❑	১০৪
মানুষ কেন যুদ্ধ করে	ইটালো ক্যালভিনো	❑	১১৫
আমরা মেরে ফেলতে যাচ্ছি	সুসাকু এন্‌ডো	❑	১২৫
চির প্রজ্বলিত শিখা	লু চুকুও	❑	১৩৯
কেন এলে	এরিক জেনস্‌ পিটারসন	❑	১৫৪
প্রবাল দ্বীপে মৃত্যু-রশ্মি	টং এনজেহেং	❑	১৭৬
যুদ্ধের সাথেই শেষ	প্যাট বেকার	❑	২১৩
যুদ্ধকালীন মিথ্যা	লুইস্‌ বেগলে	❑	২২৩
কর্জ	সেবাস্টাইন জ্যাপরিসট্‌	❑	২৩৫

যুদ্ধ

লুইগি পিরানদেল্লো

রোম থেকে রাতের ট্রেনে যারা রওনা হয়েছে। ফেব্রিয়ানোর এই ছোট্ট স্টেশানটাতে তাদের অপেক্ষা করতেই হয় ভোর পর্যন্ত। কেননা এখানেই পুরোনো ধাঁচের একটা স্থানীয় রেললাইন যুক্ত হয় সালমোনা যাবার প্রধান লাইনের সঙ্গে।

ভোরবেলা একটা গুমোট দমবন্ধ করা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় পাঁচজন লোক চুপচাপ বসেছিল। রাতটা তারা কাটিয়েছে এখানেই। এমন সময় একজন মোটাসোটা মহিলা উঠে এল ট্রেনের এই কামরায়। মহিলাটি অঝোরে কাঁদছে। তার কান্নার তালে তালে মাঝে মাঝেই নড়ে উঠছে বড়োসড়ো দেহটা — একটা বেঢপ পুঁটলির মতো। পিছনে তাকে অনুসরণ করছে যে লোকটা সম্ভবত তার স্বামী। ছোটোখাটো, পাতলা, দুর্বল চেহারা। মুখটা মড়ার মতো সাদা। চোখদুটো ছোটো। তবে উজ্জ্বল। লাজুক মানুষটি হয়তো স্ত্রীর কারণেই সহজ হতে পারছে না।

চারিদিকে তাকিয়ে লোকটা বসে পড়ল তার স্ত্রীর পাশেই। বসে টুপিটা খুলে সে ধন্যবাদ দিল সকলকে। বিনীতভাবেই বলল— সহযাত্রীরা তার স্ত্রীকে বসতে দিয়ে যে উপকার করেছেন তার জন্য সে কৃতজ্ঞ।

তারপর সে তার স্ত্রীর কোটের কলারটা টেনে ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল,

—'সব ঠিক আছে তো, সোনা?' উত্তর দেবার বদলে কোটের কলারটা মহিলাটি চোখের সামনে টেনে এনে আড়াল করতে চাইল মুখটা। যেন কিছুতেই সে তাকাবে না কারুর দিকে।

— 'কি অসহ্য এই পৃথিবীটা'। মহিলার স্বামী মন্তব্য করে একটু হাসল। হাসিটা স্বাভাবিক নয়। একটা গাঢ় বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে তার সারা মুখে।

লোকটির মনে হল — ট্রেনের কামরায় যারা আছে তাদের কাছে সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা তার কর্তব্য।

এই মহিলা সবার করুণার পাত্রী। কারণ যুদ্ধ মহিলার একমাত্র সন্তানকে সরিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে।

এই কুড়ি বছরের ছেলের জন্যই তারা উৎসর্গ করেছিল তাদের জীবন। সালমোনা থেকে বাস উঠিয়ে তারা থাকতে শুরু করেছিল রোমে। কেননা ছেলের পড়াশুনার জন্য রোমই ছিল আদর্শ জায়গা। কিন্তু এই যুদ্ধ বাধল —। ছেলের নাম তালিকাভুক্ত হল যুদ্ধের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। যেতেই হবে যুদ্ধে। বাধ্যতামূলক ভাবে। যদিও ওরা আশ্বাস

দিয়েছিল যে ছ'মাসের মধ্যে তাকে ফ্রন্টে পাঠাবে না। তবু হঠাৎ কাল তার এল — ছেলেকে তিনদিনের মধ্যে ফ্রন্টে যেতে হবে। আর তাদের বলা হল, ছেলের সঙ্গে দেখা করে তাকে বিদায় জানাতে। সুতরাং— কে জানে এই দেখা শেষ দেখা কিনা।

কোটের নীচে কুঁকড়ে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে মহিলার বিশাল শরীর। সময় সময় গলা দিয়ে উঠে আসছে বন্য জন্তুর মতো গোঙানি।

কিন্তু এ ব্যাপারে তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই নিশ্চিত যে এতগুলো কথা এখানে উপস্থিত কারুর মনেই রেখাপাত করেনি। এদের মধ্যে একজন যে মন দিয়ে সব শুনছিল বলে উঠল ঠোঁট ফাঁক করে, — 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তোমাদের ছেলে এখন ফ্রন্টে যাচ্ছে। আমারটাকে তো চলে যেতে হয়েছিল যুদ্ধ বাধবার প্রথম দিনই। এর মধ্যে অবশ্য ফিরে এসেছে দু'বার। মারাত্মক জখম হয়ে। আবার গেছে। কবে ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কিনা ঈশ্বরই জানেন।'

— 'আর আমার? দুটো জোয়ান ছেলে আর তিনটে ভাইপো। সবাই ফ্রন্টে।'

হতাশমুখে বলল অন্য একজন যাত্রী।

— 'হতে পারে। তবে আমাদের ব্যাপারটা একটু আলাদা। যেহেতু ওই আমাদের একমাত্র সন্তান।' গম্ভীর গলায় প্রভাব বিস্তার করতে চাইল স্বামীটি।

—'তাতে কী আসে যায়। যথেচ্ছ আদর দিয়ে তুমি ছেলের মাথাটি খেতে পার। কিন্তু যদি তোমার আরও দু'চারটে ছেলে থাকত। তাহলে তাকে অন্যদের চেয়ে কম ভালোবাসতে পারতে না। বাবা-মার ভালোবাসা ময়দার রুটি নয় যে তাদের টুকরো টুকরো করে সবার মধ্যে সমানভাবে বাটোয়ারা করে দেবে। সব ছেলেকেই বাবা-মা একই রকম ভালোবাসে। সে একটাই হোক বা দশটা। এমন তো নয় যে দু'জনের জন্য অর্ধেকটা করে কষ্ট পাব। বরং আমার যন্ত্রণা দ্বিগুণ।'

—'সত্যিই তো... একেবারে ঠিক কথা...।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপ্রস্তুত স্বামী বলল। —'তবু মনে করুন (এটা আপনার ক্ষেত্র নিশ্চয় নয়। কিছু মনে করবেন না) কারুর দু'জন ছেলেকেই যুদ্ধে যেতে হল। তার মধ্যে একজন ফ্রন্টেই মারা গেল। (ঈশ্বর করুন কারুর যেন এমন না হয়।)... তবু একজন তো বেঁচে রইল বাবা মাকে সান্ত্বনা দিতে... যেখানে...।'

— 'কোনো ভুল নেই। একটা ছেলে তো তবু বেঁচে রইল। এটাই সান্ত্বনা। কিন্তু একবারও কি এটা মনে হচ্ছে না যে সেই ছেলের জন্য বাবাকেও বেঁচে থাকতে হবে। আর প্রতিদিনই নিরন্তর যন্ত্রণা পেতে হবে মৃত ছেলের জন্য। যদি একমাত্র ছেলের বুকে গুলি লাগত যুদ্ধ ক্ষেত্রে। সে শেষ হয়ে যেত। তাহলে তো অন্তত বাবা নিজেকে শেষ করে দিয়ে জ্বালা জুড়োতে পারত। আমার অবস্থাটা কি তাহলে আরও খারাপ নয়?

—'যত্তসব বাজে বকবক।'

বাধা দিল লালমুখো, মোটা একজন যাত্রী। লোকটার চোখ দুটো টকটকে লাল। ফ্যাকাসে গায়ে বোধহয় এক ফোঁটাও রক্ত নেই।

রীতিমতো হাঁফাচ্ছে লোকটা। তার বিস্ফারিত চোখ দুটো থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতরের ক্রোধ, উন্মত্ততা — যা তার ওই অশক্ত দেহের পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন।

— 'যত্তসব বাজে বাকোয়াস।'

আবার বলে উঠল লোকটা। সে তার হাতটা মুখের সামনে এনে আড়াল করতে চাইছে সামনের খোয়া যাওয়া দুটো দাঁত।

— 'যত্তসব। আমরা কি আমাদের সুবিধার জন্যে বাচ্চাদের জন্ম দিই।'

অন্য যাত্রীরা নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ পর যার ছেলে প্রথম দিন থেকে ফ্রন্টে আছে, সে কথা বলল,

—'ঠিক বলেছ ভাই। আমাদের ছেলেরা যেন আমাদের কেউ নয়। দেশের সম্পত্তি...।'

—'যা বলেছ।'

মোটা যাত্রী তার নিজের সিটে নড়েচড়ে বসল। 'আমরা কি দেশের জন্য ওদের জন্ম দিয়েছি নাকি? আমাদের সন্তানেরা জন্ম নিয়েছে কারণ...। ভালো কথা, কারণ জন্মানোটা তাদের ভাগ্যে ছিল। তাই জন্মেছে। আর যখন জন্মেছে তখনই তাদের সঙ্গে আমাদের জীবনটাও একই তারে বাঁধা হয়ে গেছে। এটাই সত্যি। আমরা তাদের অন্তর্গত। কিন্তু তারা আমাদের অধীন নয়। যখন তারা কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছয়। আমরা ভুলে যাই — একদিন ওই বয়সটা আমাদেরও ছিল। আমাদেরও বাবা ছিল। মা ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল আরও অনেক কিছু... মেয়েরা... সিগারেট... নতুন বন্ধন.... এবং দেশ। এবং ঠিক ওই বয়সেই বাবা-মার কথা অগ্রাহ্য করে আমরাও সাড়া দিয়েছি দেশের ডাকে। তাদের কোনো নিষেধ শুনিনি। অমান্য করিনি। এখন আমাদের এই বয়সে, এই অবস্থায় দেশের জন্য অনুভূতি, আবেগ সব কিছুই আছে। তবে তার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র আমাদের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা। এখানে কি এমন একজনও আছে, যে সুযোগ থাকলে তার ছেলের বদলে নিজে গিয়ে ফ্রন্টে বন্দুকের মুখে দাঁড়াতে আপত্তি করবে।'

এক গভীর দীর্ঘ নীরবতা ট্রেনের সারা কামরা জুড়ে। সবাই প্রায় একসঙ্গে মাথা নাড়ল সমর্থনের ভঙ্গিতে।

—'তাহলে আমরা...'

মোটা লোকটা আবার শুরু করল বলতে।

—'তাহলে আমরা কেন আমাদের সন্তানদের কুড়ি বছর বয়সের অনুভূতিকে মর্যাদা দেব না। এটা কি স্বাভাবিক নয় যে — এই তরুণ বয়সে বাবা-মার প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য বা ভালোবাসার থেকে দেশের জন্য ভালোবাসাই প্রাধান্য পাবে। আমরা তো ক্রমশ অথর্ব হয়ে পড়ছি। বাইরে বের হতে পারি না। লড়তে পারি না। তাই আমাদের বাড়িতে থাকাই শ্রেয়। আমাদের ছেলেরাও সেইভাবেই আমাদের দেখাশুনা করবে।

কিন্তু দেশ তো রুটির মতোই অপরিহার্য — তাই না? রুটি না পেলে আমরা অনাহারে মরে যাব। তেমনই নিজেদের কোনো দেশ না থাকলে—। তাই কাউকে না কাউকে তো সেই দেশরক্ষার দায়িত্ব নিতেই হবে। আমাদের ছেলেরা, কুড়ি বছরের ছেলেরা যুদ্ধে

গেছে। তারা আমাদের চোখে অশ্রু দেখতে চায় না। কারণ যদি তারা মারা যায় এখন — সুখে মারা যাবে। মৃত্যু তো জীবনে একবারই আসে। এই কুড়ি বছর বয়সে যদি সেই মৃত্যু আসে, তার চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই। কেননা এখনও তারা জীবনের কুৎসিত দিকগুলো দেখেনি। একঘেয়েমি কাকে বলে জানে না। বিরক্তি, কদর্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বপ্নভঙ্গ... এসবের সাথে তাদের কোনো পরিচয় নেই। তাই তারা এত আনন্দিত। উদ্দীপনায় পূর্ণ। এখন যে কোনো রোমান্টিক আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে দুঃখ নেই তাদের। তারা সদা প্রস্তুত।

আর সেইজন্যই কান্না আমাদের শোভা পায় না। আমাদের উচিত হাসিমুখে তাদের এগিয়ে দেওয়া। ঠিক যেমন আমি...আমি হাসছি...।

আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। কেননা সে মারা যাবার আগে অন্তত আমাকে একটা খবর পাঠিয়েছিল। সে জানিয়েছিল — সে অত্যন্ত সুখী, পরিতৃপ্ত যে এমনভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে পারছে বলে। তার সুখেই আমার সুখ। তাই দেখছেন না — আমার পোশাকে শোকের কোনো চিহ্ন নেই। আমি কাঁদছি না...।'

লোকটি তার কোটটা তুলে ধরে সবাইকে দেখাতে চাইল। ফাঁকা দাঁতের ওপরে তার ফোলা ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছে। জলে ভরা চোখদুটো স্থির। এসব কিছু আড়াল করতে সে হেসে উঠল এত জোরে যে খুব শিগগিরই সেটা আর হাসি রইল না। পরিণত হল এক বিচিত্র শব্দে।

—'ঠিক কথা... ঠিক কথা।' সায় দিল কামরার অন্য যাত্রীরা।

সেই যে স্ত্রীলোকটি এককোণে কোট আর টুপির মধ্যে বসেছিল জড়সড় হয়ে। আজ প্রায় তিনমাস যাবৎ তার স্বামী ও বন্ধুদের কথায় নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে। ভাবতে চেষ্টা করেছে মৃত্যুর দিকে নয়। ছেলেকে পাঠিয়েছে এক বিপজ্জনক খেলা খেলতে। কিন্তু কারুর কোনো কথায় এক মুহূর্তের জন্যেও সে তার গভীর দুঃখকে ভুলতে পারেনি। এমন কারুর সাথে তার দেখা হয়নি বা এমন কারুর কথা শোনেনি এখনও সে — যাতে তার মনের ভার লাঘব হয়। এক পলের জন্যও ভুলে থাকতে পারে ছেলেকে। কিন্তু এই ভোরে, এই ট্রেনের কামরায় যাত্রীটির কথা শুনে সে চমৎকৃত হল। বিহ্বল হয়ে উঠল। সহসা সে অনুভব করল — অন্যরা হয়তো তার মনের কষ্ট তেমন ভাবে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে নিজেও সেই সব বাবা-মার উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। যারা বিনা অশ্রুপাতে তাদের সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শুধু তাই নয়। হয়তো তাদের নিজেরা হাতে ধরে পাঠিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর পরোয়ানা নিতে।

সে মাথা তুলে সেই কোণ থেকে ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল — সেই মোটা লোকটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। কীভাবে তার ছেলে রাজার জন্য, দেশের জন্য, কোনো দুঃখ না করে বীরের মতো খুশি হয়ে যুদ্ধ করতে গেছে।

তার মনে হল — এই পৃথিবীটা তার কাছে অচেনা ছিল। কেউ যে তার সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে এমনভাবে ভাবতে পারে — তার তা জানা ছিল না। সে দেখল — সবাই সেই দার্শনিক পিতাকে তার ছেলের বীরোচিত মৃত্যুর জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ঠিক তখনই। হঠাৎ। যেন সে এতক্ষণ কিছুই শোনেনি। যেন কোনো স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল,

— 'তাহলে... আপনার ছেলে কি সত্যি মারা গেছে?'

সবাই শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

আর সেই বৃদ্ধ লোকটি তার জলভরা ধূসর বাদামি চোখ দুটো তুলে একদৃষ্টে দেখল স্ত্রীলোকটিকে। কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো আওয়াজ বের হল না মুখ থেকে।

সে কেবল তাকিয়েই রইল। তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। তারপর এমন তুচ্ছ, বেখাপ্পা, বাতুলের মতো প্রশ্নে সহসা সে যেন এই প্রথম অনুভব করল যে তার ছেলে সত্যিই আর নেই... মারা গেছে। চিরদিনের মতো... চলে গেছে...।

আর ফিরবে না কোনোদিন। কখনও না।

তার মুখটা কেমন যেন এক ভাঙাচোরা মানুষের মতো হয়ে গেল। দোমড়ানো, মোচড়ানো বাতিল মুখোশের মতো। তড়িৎ গতিতে পকেট থেকে রুমালটা বের করেই সবাইকে হতবুদ্ধি করে সে ভেঙে পড়ল হৃদয় বিদীর্ণ করা কান্নায়।

যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তার ভেরতটা। ট্রেনের কামরা থেকে বাইরে — আকাশে বাতাসে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে সেই টুকরো।